হোমিওপ্যাথির উদ্ভব, বিকাশ ও সংকট

ডাঃ চণ্ডীপদ চক্রবর্তী

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
প্রসঙ্গ কথা ১৪
চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্বরূপ ২৭
হোমওপ্যাথি আবিষ্কার : এক ৩১
হোমিওপ্যাথ আবিষ্কার : দুই ৩৫
পরবর্তীকাল : দৃষ্টিভঙ্গি ৪২
চিকিৎসার আধুনিক সংকট ৫১
হোমিওপ্যাথির বর্তমান ৮৮

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্বরূপ

চিকিৎসাবিজ্ঞান দীর্ঘ সংগ্রাগের পর জাদু এবং যাজকতন্ত্রের হাত থেকে ভেষজজগতে প্রবেশ করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও রুগ্ণ মানবজাতির চরম দুর্দিন ঘোচেনি। চাপা-ঢাকা কথায় বলা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস আর অর্গাননের ভূমিকায় খোলাখুলি সমালোচনা থেকে এ সব কথা জানা যায়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশেও চিকিৎসার নামে প্রচলিত ছিল লালা, ঘাম, কফ নিঃসরণ, জোলাপের পর জোলাপ দিয়ে দাস্ত করান, বমি করান, প্রস্রাব করান, গুল বসিয়ে শরীরের তাজা মাংস পচিয়ে বিষাক্ত জিনিস বের করা, গরম ঝর্ণার জলে স্নান, শিরা কেটে কিংবা শরীরে শত শত জোঁক বসিয়ে রক্ত মোক্ষণ, অমরত্ব লাভের জন্য "সঞ্জীবন সুধার (El'xir of life) অনুসন্ধানে অজানা বিষ খাওয়ান—আরো এমনি অনেক কিছু। এসবই ছিল উন্নতমানের চিকিৎসা। রাজা-রাজড়ারাও এমনি চিকিৎসার শিকার হন।

ওষুধের গুণাগুণ নিরূপণের নির্দিষ্ট কোন মান ছিল না। যথেষ্ট সংস্কারও ছিল তার সঙ্গে। যেমন কোন গাছের রসের রঙ লাল, অতএব তা রক্তের উপর কার্যক্রর ; হৃৎপিন্ডের মত দেখতে কোন গাছের পাতা, সুতরাং তা হার্টের জন্য অমোঘ ওষুধ, অ্যান্টিমনি খাবার পর কতগুলি শূকর মরে গেলেও বাকিগুলি বেশ পুষ্ট হয় ; তাই তা হল জীর্ণ-শীর্ণ হাড্ডিসার মানুষের জন্য মোক্ষম দাওয়াই। পেটের রোগ, অতএব সীজ বা আকন্দ গাছের আঠা দিয়ে কিংবা কোন বিদাহী ওষুধ দিয়ে পেটের উপর ফোসকা তোলা, লিভার বৃদ্ধিতে পোর্টাল শিরাকে (portal vein) জ্বলন্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া কোন কঠিন রোগে টক-নুন-ঝাল-মিষ্টি-তেতো-কষা বিভিন্ন স্বাদ এবং গুণযুক্ত বহুদ্রব্যের মিকশ্চার বা সংমিশ্রিত আরক। একটা রোগে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের জন্য—ভিন্ন ভিন্ন ওষুধের ব্যবস্থাও ছিল।

রোগের কারণ হিসেবে স্থিরীকৃত ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পচা বা বিষাক্ত বাষ্প। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য ছিল—সেই ময়লা নিষ্কাশন। কোন কর্তৃত্ব বা

রোগ-আরোগ্য যা হয়, তা যথার্থ অর্থে আরোগ্য নয়—তা হচ্ছে উপশম। উপশম মানে রোগের সাময়িক বিরতি। রোগের মূল কারণ তাতে দূর হয় না। স্থিতিশীল (ক্রনিক) রোগের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। আক্রমণ প্রবল না হলে সাময়িক রোগ (অ্যাকিউট), ওষুধ ছাড়াও উপযুক্ত পথ্যে-নিয়মে আপনা থেকেই সারে। স্থিতিশীল রোগ জীবনব্যাপী, উপযুক্ত পথ্যে-নিয়মে থাকলেও ওষুধ ছাড়া কখনই সারে না। সে রোগ সারানোর মধ্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসকের কৃতিত্ব।

কোন ঘটনাজাত হঠাৎ রোগ ছাড়া উপশমের দুরকম অবস্থা দেখা দেয় : (এক) আগেকার রোগ আগেকার লক্ষণে কিন্তু আগের চেয়ে গভীরভাবে এবং জোরালোভাবে ফিরে আসে। নয়তো (দুই) প্রথম দিকের লক্ষণগুলি লোপ পায় এবং শরীরের অণ্য অংশে অন্যভাবে প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় বরাবরই বলা হয়ে আসছে—প্রথম রোগ সেরে গেছে এ হচ্ছে নতুন অন্য রোগ। আসলে তা নয়। আক্রান্ত শত্রু একদিকে পরাজিত হলে অন্যদিকে আক্রমণ করে, এ-ও ঠিক তেমনি। তার ফলে রোগ ক্রমশ জটিল হয়, দুরারোগ্য হয়।

চিরকাল ওষুধকে মনে করা হয় রোগের শত্রু। এ ধারণার বশে, ওষুধ যে জীবনের মিত্র নয় সে কথাটা চাপা পড়ে যায়। বাধ্য হলে ওষুধকে বাতিল করা হয় একেবারে, নয়তো হয় যথেচ্ছ প্রয়োগ। কিন্তু ওষুধের নিজস্ব গুণ বা ক্রিয়া আছে। রোগের উপর না হলেও ওষুধের ক্রিয়া হয় দেহের উপর। ফলে ওষুধজ-ব্যাধি দেখা দেয়। কিন্তু তাও জানা ছিল না, ওষুধজ-ব্যাধিকেও মনে করা হয় নতুন একটা অন্য রোগ। আবার তারও সেই উপশম-চিকিৎসা। এমনি করে ওষুধের অনুপযোগী বার বার আক্রমণে অঙ্গগুলি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়—অন্তত চিকিৎসায় মেরামতের সুযোগ আর থাকে না। কতকগুলি ওষুধের ক্রিয়া, কেবল রোগীর নিজের দেহে নয়, চলতে থাকে বংশগতভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও। এবং এসব নানারকম বিকৃতি আনে। যেসব ওষুধের মধ্যে আছে—আর্সেনিক, আযোডিন, আফিম, কুইনাইন, মার্কারি, সালফার এবং আরো অনেক।

রক্ত মোক্ষণে ত্বরান্বিত হয় মৃত্যু এবং পঙ্গুতা। সাধারণের কথা বাদ দিলেও, রক্ত-মোক্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাননি অস্ট্রিয়ার সম্রাট, ফ্রান্সের

যুবরাজ, ইংল্যান্ডের রাজা, এমনকি আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত। ক্রমাগত স্রাব-নিঃসারক ওষুধে রসস্রাবী গ্রন্থিগুলি উপর্যুপরি জোলাপে অন্ত্র, লিভার, পাকস্থলী, বেদনানাশক ও ঘুমের ওষুধে চেতন-স্নায়ু, এমনকি হার্ট পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়।

এপিডেমিক দেখা দিলে মৃত্যুর মিছিল দেখা দিত। অনেক সময় এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন অসহায় চিকিৎসকেরাও। রোগীদের তখন নির্ভর করতে হয়েছে ওষুধ বিক্রেতার আন্দাজ-নির্ভর ওষুধ এবং ওষুধের গলাকাটা দামের উপর। পথ্য, পরিচ্ছন্নতা, শুশ্রুষার বিষয়ে ভাবতেন না চিকিৎকেরা, দায়িত্ব ছিল না পৌর-কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের।

তাহলে দেড়শ বছর আগেও আমাদের পূর্ব-পুরুষের জীবন ছিল নিঃসহায়, নিরাপত্তাহীন। সাংঘাতিক ক্ষেত্রে, মৃত্যু আর চিকিৎসার মধ্যে ব্যবধান ছিল কম-ই। রোগ-মুক্তি মানুষের কামনা। কিন্তু প্রতিকার তার হাতে নয়। সে চিকিৎসা চায়, অথচ চিকিৎসার নিপীড়নের কজা থেকে বাঁচার কোন কলা কৌশল সে জানে না। জনগণ তাই হতাশাগ্রস্ত শঙ্কাকুল, রোগ এবং চিকিৎসা উভয় সংকটে ঈশ্বর-নির্ভর। এ অবস্থায় চিকিৎসকেরও বিবেক নির্বাক এবং নিঃসহায়। তাদের সহায় কেবল কর্তৃপক্ষের দোহাই। অবশ্য আত্ম-সন্তুষ্ট ছিলে না সকলেই। কিন্তু অজানার রাজ্যে এগোবার জন্য না ছিল কোন পথ ও প্রন্থা, না ছিল কোন প্রতিষ্ঠানগত প্রেরণা। বিদ্রোহ নয়, কোন বিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ চিল বিপজ্জনক—সে জন্য নির্বিচার চরম মূল্যের মাস্তি ছিল নির্মম। তথাপি নীরব কাটেনি একেবারেই—যদিও সে বিদ্রোহের কথা শোনা যেতো অনেক দিন, এমনকি একশো দুশো বছর পর পর।

সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানের তখন ক্রাইসিস—একটা ক্রান্তিলগ্ন। রোগের নামে তখন মানুষ যেমন জড়িয়ে যেতো ভয়ে, চিকিৎসার নামে তার চেয়েও বেশি কম্পিত হতো মানুষের দেহ, মন। হাতুতে চিকিৎসা জনপ্রিয় হওয়ার এটাও একটা মস্ত কারণ। পরবর্তীকালেও তা ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত ও শিক্ষাহীন সমস্ত সমাজে ঐতিহ্য-সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য উদ্যম যে মানুষের, রোগের আঁচড়ে ক্লিষ্ট হয়ে সেই মানুষ হয় বিভ্রান্ত, অদৃষ্টবাদী।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার : এক

প্রয়োজন উদ্ভাবনের জন্ম দেয়। কিন্তু আপনা-আপনিই তা সম্ভব হয় না। উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন হয় নিবিড় অনুভূতি, ত্যাগ-স্বীকার, অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা, একাগ্রতা এবং শ্রম। মানবিক কারণে এমন কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা সাধারণ থেকে ভিন্ন মানুষ। যন্ত্রণাকাতর অসহায় নর-নারীর হাহাশ্বাস সেদিন হ্যানিম্যানকে নাড়া দেয়। গতানুগতিক ধারায় তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর মনে বিদ্রোহ জাগে। পরোক্ষ নয়, এ বিদ্রোহ জীবন্ত। যে চিকিৎসা মানুষকে সুস্থ্যতায় পুনর্বাসন করে না, যে চিকিৎসা মানুষের দুর্ভোগ বাড়ায়, সে বৃত্তি তাঁর নয়। তিনি তা ত্যাগ করেন। ত্যাগ তাঁর প্রিয় পরিজনের জন্য, প্রিয় রোগীর জন্য—প্রিয় মানবজাতির জন্য। ঐ বিদ্রোহ আগেও সময় সময় জেগেছে, কিন্তু এ দৃষ্টান্ত চিকিৎসাজগতে তুলনাহীন। কোন দারিদ্র্য দুঃখদুর্দশা সত্যের চেয়ে বড় ছিল না তাঁর কাছে। অন্যদিকে এত বড় জ্ঞান ও পান্ডিত্য, বিভিন্ন ভাষায়, বিদ্যায়, চর্চায় এমন দখল, এত বড় একক প্রতিভা, এত কিছু সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান-গবেষনা-আবিষ্কার, চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিরল। দেশ কোথায়, কি জাতি, ধর্ম কি, এ সবের জবাবে হ্যানিম্যানের পরিচয় বিধৃত নয়। তাঁর পরিচয় : তিনি আরোগ্য-বিজ্ঞানের স্রষ্টা। তাঁর ধর্ম : বিজ্ঞানের বাস্তবতায় মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণসাধন।

হ্যানিম্যানের কায়কলাপ ও নতুন নিরীক্ষা আরম্ভ হয় প্রথম প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতি অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিতে। বিভিন্ন দেশ ও ভাষার প্রখ্যাত চিকিৎসকদের গ্রন্থ পড়াশোনা ও জার্মান ভাষায় সে-সবের অনুবাদ। উদ্দেশ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অগ্রণী চিন্তাধারাকে একত্র করে সম্মুখে আনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রসায়নের বিশেষ স্থান ও অবদান আছে। সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। অনুবাদের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণা ও আবিষ্কারের ছাপ

রাখেন। একই সঙ্গে পুরাতন প্রথার সংস্কারের তাজও হাতে নেন। শল্যবিদ্যা, ভেষজতত্ত্ব, ধাত্রী ও শুশ্রুষা-বিদ্যা, স্বাস্থ্য পথ্য-চিকিৎসা—সর্বত্র সংস্কারের সাক্ষ্য আছে। এসব এখনো বর্জিত নয় বর্তমানের জার্মানিতে। বেশিরভাগ কাজকে বরং সংস্কার না বলে উদ্ভাবন বলাই সঙ্গত। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি তারপরও। অর্থাৎ আরোগ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি এ-সমস্ত সংস্কারে বা উদ্ভাবনে। তবে খ্যাতি জার্মান সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি পায়।

পাশ্চাত্যে অ্যরিস্টটল, হিপোক্রেটিস প্রভৃতি প্রকৃতি-দার্শনিক ও গবেষকরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে জানতে পারেন—রোগ আরোগ্যের প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে "সদৃশ দ্বারা সদৃশ" (likes by likes)। অর্থাৎ প্রকৃতিজগতে প্রাকৃতিকভাবে একটা সদৃশ রোগ অন্য একটা সদৃশ রোগ দ্বারা আরোগ্য হয়।[১] কিন্তু এ নিয়ম প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সদৃশ রোগ মানুষের হাতে বা আয়ত্তে নেই কিংবা কৃত্রিমভাবে তা সৃষ্টি করারও উপায় ছিল না। অন্যদিকে দার্শনিকদের এই জ্ঞান ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর কোন বিজ্ঞান ছিল না—না রোগবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান বা আরোগ্যবিজ্ঞান।

প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতা হ্যানিম্যানকে নিরাশ করেনি, এগিয়ে দেয় সামনের দিকে। নতুন গবেষণা প্রচলিত পদ্ধতিকে সহজ করার প্রচেষ্টায় নয়, বিগত ওষুধ তৈরি-প্রক্রিয়াকে সংশোধন করা, কিংবা ওষুধ-ক্রিয়াকে কিছুটা সংযত করার উদ্দেশ্যেও পরিচালিত হয়নি। কারণ ব্যর্থতা এসেছে এই তিন দিক থেকেই। সুতরাং তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয় গতানুগতিক ছক থেকে। জিজ্ঞাসা জাগে চিকিৎসাজগতের বিজ্ঞান কোথায়, কোথায় তার প্রত্যুত্তর। পদার্থ বিজ্ঞানে—নিউটনের মত এ যাত্রা। এ যাত্রা সাহায্যহীন, সঙ্গীহীন, অন্ধকারে আলোর অন্বেষায়। পেছনে বুভুক্ষা, চার পাশে দারিদ্র্যের দংশন, হাতে সম্বল কেবল মাত্র অনুবাদকর্মের কয়টি টাকা। কোথা থেকে তাঁর এ প্রেরণা? হ্যানিম্যানের কাছেই আমরা জেনেছি—"মানবজাতির পার্থিব শ্রেষ্ঠ

১. ভারতের আয়ুর্বেদাচার্য চরক এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিশিষ্ট গবেষক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা সদৃশের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতেন। তাঁদের চিকিৎসা গ্রন্থে এ তত্ত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

সম্পদ স্বাস্থ্য"। সুতরাং এই সম্পদ রক্ষার জন্য সত্য আবিষ্কারে মানুষের কোন ত্যাগই বড় হয় না।

হ্যানিম্যানের নতুন চিন্তা : ওষুধে রোগ আরোগ্য হয়, তা হলে ওষুধ কি রোগ সৃষ্টি করে? তা ছাড়া তো ওষুধে রোগ সারবার কথা নয়। তিনি স্থির করেন, সুস্থ মানব-শরীরে ওষুধ পরীক্ষা করবেন। অজানা পথে চলার বিপদ আছে। এ বিপদে অন্যকে টানা যায় না। অন্যের দেহে পরীক্ষার উপলব্ধি চিকিৎসকের উপলব্ধি হয় না। সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসকের পক্ষ হয়ে হ্যানিম্যান নিজের শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এই প্রথম।

তাতে অনুমানের অচলায়তন ধসে গেল। সুস্থ নীরোগ মানুষের দেহে ওষুধ বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিল। ওষুষের ক্রিয়ায় সুস্থ দেহের জবাব—ওষুধ জীবনের শৃঙ্খলা নষ্ট করে, যন্ত্রণা জন্মায়—রোগ সৃষ্টি করে। ওষুধের রোগক্রিয়ায়, বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় এ সাক্ষ্য। ওষুধের পর ওষুধ খেয়ে, প্রত্যেক ওষুষের স্তন্ত্র ধারায় রোগ সৃষ্টির তথ্য দিলেন হ্যানিম্যান।

বস্তু বলতে সবই বস্তু। ওষুধ নামে আলাদা কোন বস্তু নেই। কিংবা কোন বস্তুর স্বতন্ত্র কোন ওষুধ-সত্তা নেই। সরল এবং সহজ ভাষায় বলা যায়—কোন বস্তুর এতটুকু আরোগ্যকারী ক্ষমতা নেই। এমন কি যাদেরকে ওষুধ বলা হয় তাদেরও না। আরো সহজ করে সোজা কথায় বলা যায় পৃথিবীতে ওষুধ বলতে কিছু নেই। তাহলে ওষুধ কি, ওষুধের কাজ কি, ওষুধ কাকে বলে? মানবশরীরে পরীক্ষার আগে এ জবাব পাওয়া যায়নি। হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। ওষুধের সংজ্ঞা নেই আর কোথাও। যা আছে মনগড়া, বিজ্ঞানসম্মত নয়। যা বলা হয় তা হচ্ছে—"ওষুধ মানে ওষুধ গুণসম্পন্ন বস্তু"—"যা রোগের উপশম অথবা আরোগ্য আনে।" কিন্তু যে বস্তু রোগের উপশম বা আরোগ্য আনে, সে বস্তুই সুস্থ-অসুস্থ মানুষের দেহে বিষ-ক্রিয়াও করে। তাহলে অন্তত এমনভাবে বলা উচিত—যে বস্তু রোগে ব্যবহারে উপশম কিংবা আরোগ্য হয়, কিন্তু সুস্থ দেহে ব্যবহারে, এবং অসুস্থ দেহে বেশি বা বড় মাত্রায় ব্যবহারে বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুস্থ দেহের কথাটা কোথাও নেই।

কিন্তু যথার্থ রোগ ও রোগের পরবর্তী অবস্থা এক নয়। রোগ নিঃশেষের সঠিক সময় জানার কোন উপায় নেই। অন্তত হাসপাতাল ছাড়া। তাহলে রোগ নিঃশেষের পরবর্তী অবস্থায় একই ওষুধ ব্যবহারে বিষক্রিয়া আরম্ভ হবে।

নীরোগ দেহে ওষুধ প্রয়োগ ও পরীক্ষার সুস্পষ্ট তথ্যে ওষুধের বৈজ্ঞানিক অর্থ হচ্ছে—ওষুধ হলো যে-বস্তু তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায় জীবদেহের স্বাভাবিক সুশৃঙ্খল কর্মধারা নষ্ট করে ও রোগ জন্মায়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রুগ্ণ দেহে ওষুধ প্রয়োগ বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ সেখানে রোগ থাকে। তা থেকে ওষুধজ রোগকে পৃথক করে চেনা যায় না। ওষুধে সৃষ্ট রোগ প্রাকৃতিক নয় কৃত্রিম। কিন্তু অভিপ্রকাশ প্রাকৃতিক রোগের মতই। শরীর ও মন, অন্য কথায় অঙ্গ এবং চেতনা, দুদিক থেকে রোগের প্রকাশ। তাই পশু-পাখির উপর ওষুধপরীক্ষা যথেষ্ট নয়। তাদের চেতনায় বিকাশ ও প্রকাশ অত্যন্ত অস্পষ্ট।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। আর্সেনিক, আফিম, ধতুরা বা কোকেন কেবল এ সমস্ত উগ্রবীর্য ওষুধই নয়, সাধারণ হীন-বীর্য ওষুধ—যেমন, তুলসী, বাসক, দুর্বা, নাক্সভমিকা, সোডিবাইকার্ব এগুলি থেকেও বিষক্রিয়া হয়। কতগুলি পদার্থ ওষুধ হিসেবে কাজ করে না বলে ধারণা আছে। ধারণাটা ঠিক নয়। স্থূল অবস্থায় এগুলি কাজ করে না সত্য, কিন্তু হোমিওপ্যাথির বিশেষ এক পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম্য আকারে নিয়ে তা থেকে ক্রিয়াশীল ওষুধ তৈরি করা যায়। এর মধ্যে আছে সোনা, রূপা, কোবাল্ট, প্ল্যাটিনাম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, অতি-সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য পদার্থ চিনি, লবণ, জল, দুধ, মাটি ইত্যাদিও। এ পদ্ধতিতে এগুলিকে শক্তিতে রূপান্তরিভ করা হয়। তেমন অবস্থায় এগুলিও যার যার নিজস্ব ধারায় বিষক্রিয়া করে। বিষক্রিয়া করাই ওষুধের গুণ এবং তার মধ্যেই ওষুধের রূপ আর পরিচয়। বিষক্রিয়াতে রোগ সৃষ্টি। তার মানে আবারো সেই কথা ওষুধের কাজ রোগ সৃষ্টি)অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওষুধ হচ্ছে স্বতন্ত্র এক একটা কৃত্রিম রোগ।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার : দুই

দর্শন এবং বিজ্ঞানে এককালে খুব বিরোধ ছিল। একে অপরকে এড়িয়ে চলত। এমন একটা ভাব যেন দর্শনে বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানে দর্শনের স্থান নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সম্ভবত হ্যানিম্যানই প্রথম উচ্চারণ করেন : বিজ্ঞান-শূন্য দর্শন এবং দর্শন-শূন্য বিজ্ঞান হচ্ছে বাজে জিনিস, বড়জোর একটা হস্ত-শিল্প—চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে এ কথা অধিকতর সত্য।

আসলে বিষয় দুটি পরস্পরের পরিপূরক। কোন শক্তিকে দেখা যায় না, ধরা বা ছোঁয়া যায় না। কিন্তু কাজের মাধ্যমে শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলেই যদি বিজ্ঞান বলে, শক্তি নেই। কিংবা কোন শক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজ দেখেও দর্শন বলে, কাজটা কাজ নয়, তাহলে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। কাজ দেখে শক্তিকে বিজ্ঞানের মেনে নিতে হয়, আর কোন ক্রিয়া-সমআদিত বিষয় থেকে কাজকে মেনে নিতে হয় দর্শনের। তবে, আকারগত মিলে অনেক সময় দর্শনের চলে, কিন্তু যথার্থতা যাচাই না করলে বিজ্ঞানের চলে না। কেবল এটুকু পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে একদিকে জীবন-মন দেহ, অন্যদিকে—জীবন রোগ-ওষুধ, এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ ছাড়া রোগ ও চিকিৎসা কি, কেন, কার, এবং কিভাবে বোঝা যায় না। অ-হোমিওপ্যাথিতে এখন পর্যন্ত জীবন ও দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তাই দেহ-চিকিৎসায় জীবন সারে না—আর জীবন সারে না বলে দেহ হয় না রোগমুক্ত।

হোমিওপ্যাথি কার্যত বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যায়।

এক. প্রথম আবিষ্কার : ওষুধ। এ সম্পর্কে আগে কতকটা বলা হয়েছে। এখানে আরেকটু পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণে জানা গেছে—ওষুধ মানুষের মিত্র নয়, চির শত্রু। রোগের চেয়ে ওষুধের শত্রুতা আরো বড়। রোগের আক্রমণের কিছু শর্ত আছে, যেমন কোন বিরুদ্ধ শক্তির

আক্রমন , সেই শক্তিকে বাধা দিতে শরীরের অক্ষমতা এবং তার প্রভাব গ্রহণ, সেই প্রভাবে প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা এবং তার মাধ্যমে যন্ত্রণা সৃষ্টি। এসব শর্ত পূরণ না হলে কারো রোগ হয় না। কিন্তু ওষুধের আক্রমণ নিঃশর্ত এবং সর্বজনীন। কারণ ওষুধ প্রয়োগ করা যায়, তার মাত্রা এবং পুনর্প্রয়োগও যেমন খুশি করা যায়। কাছাড়া বিশেষভাবে প্রয়োগে ওষুধ দ্বারা রোগকে পরাভূত করা যায়। এজন্য ওষুধ বলতে বোঝায়—যে পদার্থ স্থুল বা শক্তি বিকশিত অবস্থায় সুস্থ মানবদেহে প্রয়োজিত, সুস্থ দেহে যা নিজস্ব ও বিশিষ্ট ধারায় কৃত্রিম রোগ উৎপাদনে সমর্থ, বয়স এবং লিঙ্গভেদে যা বহু পরীক্ষিত এবং যার নিরীক্ষিত ক্রিয়াগুলি (বা অভিব্যক্ত লক্ষণগুলি) শারীরিক, মানসিক ও হ্রাস-বৃদ্ধিগতভাবে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সুবিন্যস্ত।

দুই. রোগ হচ্ছে—মন বা দেহজগতের জীবন বিরোধী কোন দুষ্ট ক্রিয়ায় উত্তেজিত জীবনের প্রতিক্রিয়া এবং তার ফলে মান ও শরীরযন্ত্রের পরিবর্তিত, বিরুদ্ধ, বিশৃঙ্খল ক্রিয়াক্রলাপ। তাহলে সীমিত সংখ্যক ও নির্দিষ্ট শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়া—রোগ বলতে শরীরের ভিতরে বা বাইরে অবস্থিত, জীবিত কিংবা মৃত কোন বস্তুকে বোঝায় না। তাহলে চিকিৎসার অর্থ এবং উদ্দেশ্য বলতে বোঝায়—জীবন-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় আনা। তার মানে, চিকিৎসা দ্বারা মানুষের রুগ্ণ দেহ থেকে রোগ সৃষ্টিকারী বলে কোন জিনিস নেই সরিয়ে দেওয়ার মত, নেই কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, কেটে কিংবা নিষ্কাশন করিয়ে ফেলার মত, নেই কিছু নিষ্ক্রিয় বা নিধন করবার মত।

তিন. রোগ বা ওষুধের ক্রিয়া হয় বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন ক্রিয়াসমন্বিত জীবিত শরীরে। মৃত দেহে রোগ বা ওষুধ কারোর কোন ক্রিয়া হয় না। শরীর জীবিত থেকে জীবন পরিচালনাকারী, অদৃশ্য অস্পৃশ্য এক ধরণের শক্তিতে। এর নাম জীবনীশক্তি। অতএব, কোন অঙ্গ নয়, এমন কি অঙ্গসমষ্টিতেও নয়, রোগ এবং ওষুধের ক্রিয়া জীবনীশক্তিতে। প্রাকৃতিক রোগে এবং ওষুধজ রোগ সৃষ্টিতে জীবনীশক্তি ভারসাম্য হারায়।